ছোটদের

পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
(বিজ্ঞপ্তি নং ১ টি. বি., ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)

ছোটদের আনন্দমঠ

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দশ আনা
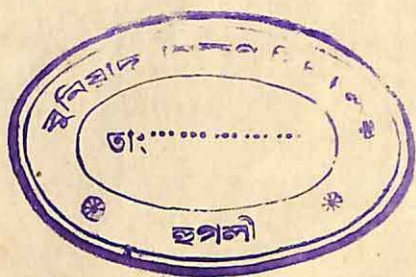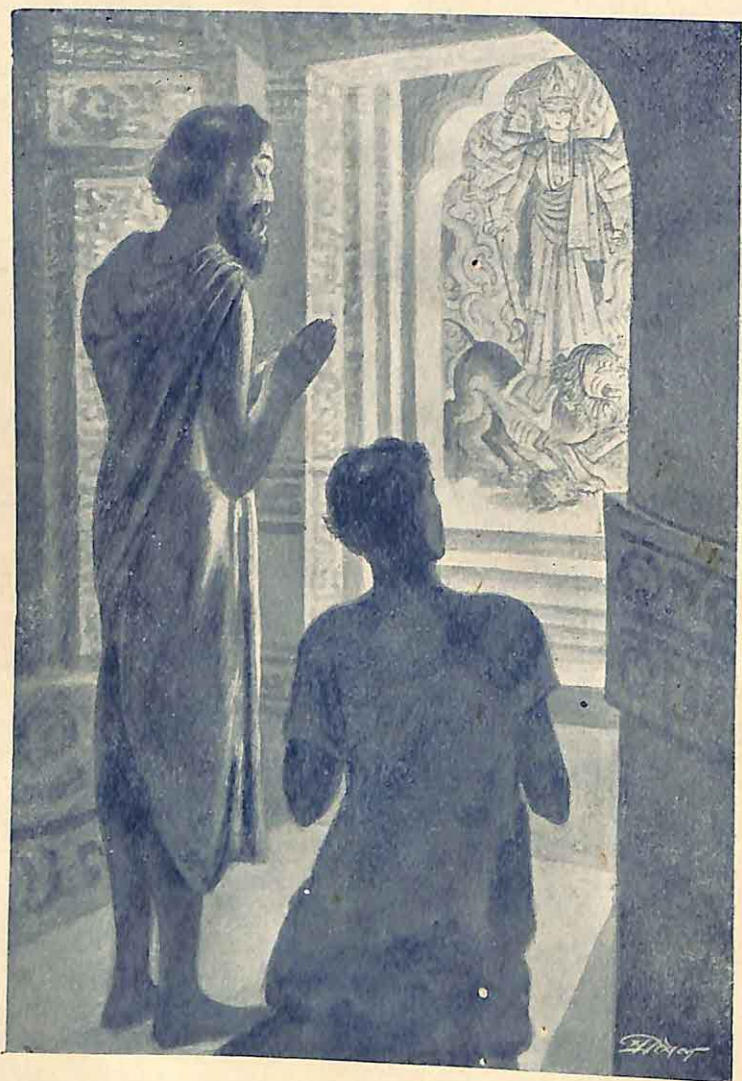
"এই—মা:যা হইবেন। এস, উভয়ে মাকে প্রণাম করি।" —১৫ পৃঃ

১১৭৬ সাল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বৎসর।

দুর্ভিক্ষে দেশ ছারখার হইতেছে। লোকে ভিক্ষা পায় না, উপবাস করে। ঘরের জিনিসপত্র বেচে, তারপর ঘরবাড়ি জোত-জমা বেচে। শেষে ছেলেমেয়ে স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিনে কে! খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যের অভাবে লোকে গাছের পাতা খায়, ঘাস খায়, আগাছা খায়। ইতর ও বন্য লোকেরা কুকুর, ইঁদুর, বিড়াল খায়।

রোগে সময় পাইল,—জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তে ঘরে ঘরে লোক মরিতে লাগিল। কেহ দেখে না, মরিলে কেহ ফেলে না। যে বাড়িতে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে বাড়ির লোকেরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্। কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। বহু পরিবারের মধ্যে এখন আছেন তাঁহার স্ত্রী, তিনি নিজে, আর এক শিশুকন্যা।

গ্রামে থাকা আর চলিতে পারে না। তাই মহেন্দ্র ও কল্যাণী একদিন সকালবেলা মেয়েটিকে কোলে লইয়া রাজধানীর দিকে চলিলেন। মহেন্দ্র সঙ্গে লইলেন বন্দুক, কল্যাণী কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইলেন একটি ছোট বিষের কৌটা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রৌদ্রে পথ চলিয়া তাঁহারা সন্ধ্যার সময় এক চটিতে পৌঁছিলেন। চটিতে বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, কিন্তু একটিও মানুষ নাই।

মেয়ের জন্য দুধের দরকার। কল্যাণী ও মেয়েটিকে চটিতে রাখিয়া মহেন্দ্র একটা মাটির কলসী হাতে লইয়া বাহির হইলেন। কলসী সেখানে অনেক পড়িয়া ছিল।

কল্যাণী একা মেয়ে লইয়া সেই প্রায়-অন্ধকার কুটীরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল।

সহসা সামনের দরজায় কল্যাণী কি একটা ছায়ার মত দেখিলেন। অতিশয় শুষ্ক শীর্ণ—অতিশয় কালো, উলঙ্গ, বিকটাকার একটা মানুষের ছায়ার মত। সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিয়া কাহাকে ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া আসিল—শুষ্ক, কালো, লম্বা, উলঙ্গ। তারপর আর একটা, তারপর আরও একটা। এই ভাবে অনেকগুলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। সেই ছায়া-মূর্তিগুলি কল্যাণী ও তাঁহার মেয়েকে লইয়া এক গভীর জঙ্গলে চলিয়া গেল।

বনের এক পরিষ্কৃত স্থানে কল্যাণী ও তাঁহার মেয়েকে রাখিয়া, দলপতি কল্যাণীর অলঙ্কার ভাগ করিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত দস্যুরা অলঙ্কার চায় না, চায় খাদ্য। ইহা লইয়া দলপতির সঙ্গে দস্যুদের বিবাদ বাধিল। উত্তেজিত দস্যুরা দুই-এক আঘাতেই দলপতিকে মারিয়া ফেলিল।

লইয়া শুইয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিল। দেখিল, সে স্থানে কেহ নাই—মা-ও নাই, মেয়েও নাই। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল 'মার মার' শব্দ করিয়া চারিদিকে ছুটিল।

দস্যুদের বিবাদের সুযোগে কল্যাণী মেয়ে কোলে করিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মেয়েটি ভয় পাইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন পলাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া এক গাছের নিচে বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু মুদিয়া একমনে ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি হে মধুসূদন!"

এই সময়ে কল্যাণী যেন স্বর্গীয় গান শুনিতে পাইলেন—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

গীত ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। শেষে কল্যাণী মাথার উপর গানের সুর শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, এক শুভ্রশরীর শুভ্রকেশ শুভ্রবদন ঋষিমূর্তি! কল্যাণী প্রণাম করিতে গিয়া চেতনা হারাইলেন।

তখন ক্ষুধিত, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদের একজন বলিল, "শৃগাল কুকুরের মাংস অনেক খাইয়াছি। ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এস ভাই, আজ সকলে মিলিয়া এই বেটাকে পোড়াইয়া খাই।"

আর একজন বলিল, "যদি মহামাংস খাইয়াই আজ

প্রাণ রাখিতে হয়, তবে এই বুড়ার শুক্‌না মাংস কেন খাই? এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।"

তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা

সেই বনের মধ্যে একটি বড় মঠ আছে। দোতলা দালান—মধ্যে অনেক দেবমন্দির, সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে ঘেরা, আর বুনো গাছপালায় এমনই ঢাকা যে, দিনের বেলায় নিকটে গেলেও কেহ বুঝিতে পারে না, এখানে কোন কোঠা আছে।

এই মঠের এক কুঠরীর মধ্যে কল্যাণীর প্রথম্ চৈতন্য হইল। সম্মুখেই দেখিলেন, সেই শুভ্রবেশ মহাপুরুষ। তিনি একটু দুধ দিয়া বলিলেন, "মা! মেয়েকে কিছু খাওয়াও, নিজে কিছু খাও।"

কল্যাণী মেয়েকে দুধ খাওয়াইলেন, নিজে খাইলেন না, বলিলেন, "আমার স্বামী এখনও কিছু খান নাই। তাঁহার দেখা না পাইলে বা তাঁহার খাওয়া হইয়াছে কিনা না জানিলে আমি কিছু খাইতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি ব্রহ্মচারীর পাদোদক পান করিলেন।

ব্রহ্মচারী একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর সকল সংবাদ জানিলেন। শেষে বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে এই মন্দিরে থাক, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।"

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নয়,

তাই আলো তত প্রখর নয়। রাস্তার ধারে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের নিচে এক স্থানে বড় জঙ্গল। ব্রহ্মচারী সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়া দেখিলেন, সারি সারি গাছের নীচে অস্ত্র লইয়া দুই শত লোক নীরবে বসিয়া আছে। ব্রহ্মচারী গৈরিক বসন পরা এক বলবান সুন্দর যুবককে ইসারা করিলেন। সে উঠিয়া আসিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ভবানন্দ, আমি ডাকাতের হাত হইতে মহেন্দ্র সিংহের স্ত্রী-কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। তুমি মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী-কন্যা তাহার জিম্মা করিয়া দেও। এখানে জীবানন্দ থাকিলেই চলিবে।"

এদিকে মহেন্দ্র দুধ লইয়া চটিতে আসিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও স্ত্রী-কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না। কাজেই নগরে গিয়া রাজপুরুষদের সাহায্যে স্ত্রী-কন্যার খোঁজ করিবেন, ইহা ভাবিয়া নগরের দিকে চলিলেন।

১১৭৩ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর লোকের ধন-প্রাণ রক্ষার ভার

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।

লোক না খাইয়া মরুক, ইংরেজের খাজানা আদায় বন্ধ হয় না। আদায় হইয়া সেপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে যায়। সেদিনও গাড়ী বোঝাই হইয়া খাজানা যাইতেছিল।

মহেন্দ্র দেখিলেন, পঞ্চাশ জন সঙ্গীনধারী সিপাহী ও খাজানা-বোঝাই গোরুর গাড়ী পথ আটকাইয়া যাইতেছে। তিনি জঙ্গলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া একজন সিপাহী বলিয়া উঠিল, "এহি একঠো ডাকু ভাগতা হৈঁ!" মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস সিপাহীদের দৃঢ় হইল। তাহারা মহেন্দ্রকে ধরিয়া দড়ি দিয়া হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

এদিকে যে চটিতে মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যা সহ আশ্রয় লইয়াছিলেন, ভবানন্দও সেইদিকে চলিলেন। কিছুদূর যাইতেই ঐ সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহারও দেখা হইল। সিপাহীরা তাঁহাকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল।

ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে চিনিতেন। তাঁহার পরামর্শে

মহেন্দ্র গাড়ীর চাকার উপর হাতের বাঁধনটা রাখিলেন। চাকার ঘষায় ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। পায়ের দড়িও ঐরূপে কাটিলেন। ভবানন্দও সেরূপ করিয়া বাঁধন কাটিয়া ফেলিলেন। উভয়ে নীরব।

যেখানে রাস্তার ধারে ছোট পাহাড়, সেখান দিয়াই সিপাহীদের যাইবার পথ। সেই পথে গাড়ী যাইতেই দুই শত অস্ত্রধারী লোক সিপাহীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। সিপাহীরা অনেকে হত ও আহত হইল। সিপাহীদের ইংরেজ অধ্যক্ষ মারা গেল। অবশিষ্ট সিপাহীরা ভয়ে পলাইয়া গেল। এই আক্রমণকারী দলের নায়ক ছিলেন জীবানন্দ।

জীবানন্দ অনুচরদের সহিত লুণ্ঠিত ধন যথাস্থানে রাখিতে চলিয়া গেলেন। ভবানন্দ ও মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে?"

ভবানন্দ বলিলেন, "তোমার তাতে প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র। আজ আপনার কাছে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

ভবানন্দ। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না—অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে!

মহেন্দ্র ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ যে ডাকাতি!"

ভবানন্দ বলিলেন, "হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।"

মহেন্দ্র। ডাকাতের কাছে এত উপকার পাওয়ার চেয়ে আমার উপকার না পাওয়াই ভাল।

ভবানন্দ। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আইস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কি?"

ভবানন্দ একথার কোন উত্তর না দিয়া চলিলেন। মহেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এরা কি রকম দস্যু?

সেই জ্যোৎস্নামাখা রাত্রিতে দুই জনে মাঠ পার হইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে ভবানন্দ গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মাতা কে ?" উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাহিতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥"

মহেন্দ্র বলিলেন, "এ ত দেশ, এ ত মা নয় !"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই আমাদের মা।"

মহেন্দ্র এবার বুঝিলেন, বলিলেন, "তবে আবার গাও।"

ভবানন্দ আবার গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈ ধৃ্ তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীম্ নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী-বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্ ।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ॥”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে ?”

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা সন্তান—মায়ের সন্তান। তুমি সন্তান হইবে ?”

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী-কন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবানন্দ। তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখিবে চল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই আনন্দময় প্রভাতে—আনন্দময় কাননে “আনন্দমঠে” সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হইলে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বলিলেন, “দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। চল, তোমাকে তাহাদের কাছে লইয়া যাই।”

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে লইয়া প্রথমে দেবালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্র দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী, বিষ্ণুর কোলে এক দেবীর মূর্তি।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বিষ্ণুর কোলে যাঁহাকে দেখিতেছ, তিনি আমাদের মা—আমরা তাঁহার সন্তান। বল—বন্দে মাতরম্।"

মহেন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে অন্য কোঠায় লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্মচারী। মা—যা ছিলেন। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলেন। তারপর তাঁহারা এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়া মাটির নীচে এক কোঠায় আসিলেন। সেখানে এক কালীমূর্তি।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন। মার আজ কিছুই নাই, এই জন্য উলঙ্গিনী। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান, তাই মার গলায় হাড়ের মালা। মা আপনার শিব আপনার পায়ে দলিতেছেন।"

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন উভয়ে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ দিয়া উঠিয়া এক শ্বেত-পাথরের তৈয়ারি প্রশস্ত মন্দিরে আসিলেন। সেখানে এক স্বর্ণ-নির্মিতা দশভুজা প্রতিমা প্রভাত সূর্যের কিরণে ঝল্‌ঝল্ করিয়া যেন

হাসিতেছেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই দেখ—মা যা হইবেন। এস, আমরা মাকে প্রণাম করি।"

মাকে প্রণাম করিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায়? তাহাদের একবার মাত্র দেখিয়া বিদায় দিব। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।"

ব্রহ্মচারী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র নাট-মন্দিরে গিয়া দেখিলেন, কল্যাণী মেয়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারীর এক অনুচর খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে দিলেন। যাহা বাকী রহিল, কল্যাণী খাইলেন। মেয়েকে দুধ খাওয়াইলেন। তারপর দুইজনে বসিয়া কি কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

আলোচনায় বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। তখন তাহারা পদচিহ্নের দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু কোন্ পথে যাইতে হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন। ধীরানন্দ গোস্বামী নামে একজন সন্তান এক দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে রাজপথে বাহির করিয়া দিলেন।
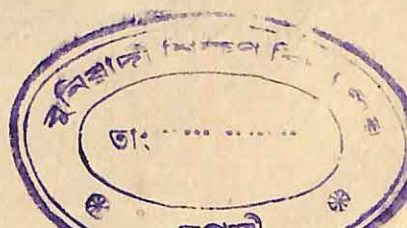
রাজপথের ধারে ধারে বন। এক স্থানে বনের মধ্য দিয়া একটি ছোট নদী কল-কল শব্দে বহিতেছে। কল্যাণী পরিশ্রান্ত হইয়া নদীতীরে এক গাছের নিচে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন।

দুইজনে বসিয়া কথা বলিতেছেন, কথায় কথায় অন্যমনস্ক
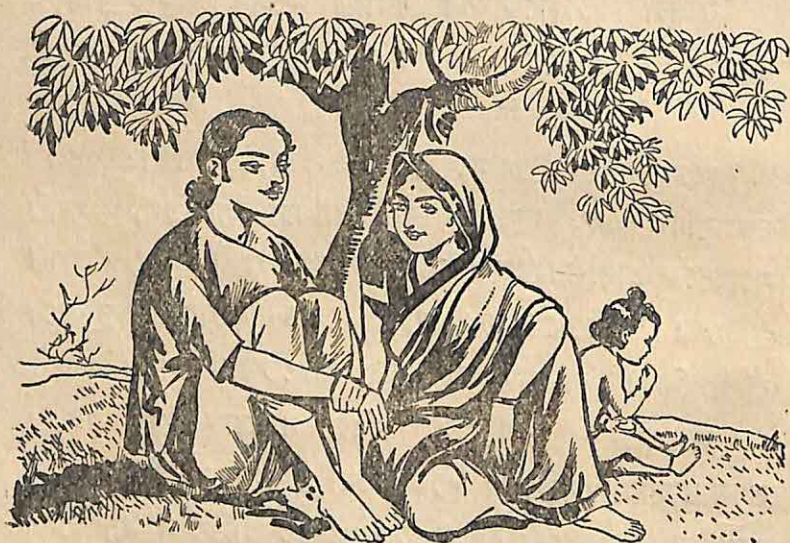
হইয়া পড়িয়াছেন, কল্যাণী এক সময়ে বিষের কৌটাটি মাটিতে রাখিলেন। এদিকে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা খুলিয়া বিষের বড়ি মুখে পুরিল।

"কি খাইল! কি খাইল! সর্বনাশ!" বলিয়া কল্যাণী মেয়ের মুখে আঙ্গুল দিয়া বড়ি বাহির করিলেন। কিন্তু মেয়ে যে দুই-এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহাতেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। শোকে দুঃখে পাগলিনী কল্যাণী তখন বিষের বড়ি নিজেই খাইয়া ফেলিলেন।

"কল্যাণী, কি করিলে!" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কল্যাণী স্বামীর পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন, "তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহা সফল কর, দুইজন একত্র অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।"

এদিকে মেয়েটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল। মহেন্দ্র মেয়েকে কল্যাণীর কোলে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বনের মধ্য হইতে গীত শুনা গেল,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!"

সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীও মোহভরে ডাকিতে লাগিলেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

ক্রমে ক্রমে কল্যাণীর কথা বন্ধ হইল। সত্যানন্দ আসিয়া মহেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজধানীতে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে, রাজ-সরকারের খাজানা সন্ন্যাসীরা মারিয়া লইয়াছে। তখন সরকারের হুকুমে নজরদ্দী জমাদার সিপাহী লইয়া সন্ন্যাসী ধরিতে বাহির হইল। সে পথের পার্শ্বে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে পাইয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার শিশুকন্যা সেই গাছের নিচে পড়িয়া রহিল।

কিছুদূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদের অনুমতি লইয়া মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন,—

"ধীরসমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্ধর গমন বিলম্বনমতিবিধুরা সুকুমারী॥"

নগরে পৌঁছিলে কোতোয়াল রাজসরকারে এতালা পাঠাইয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে ফাটকে রাখিল।

রাত্রি উপস্থিত। কারাগারে বন্দী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "কাতর কেন বাপু? মহাব্রত গ্রহণ কর, শক্তি আসিবে। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে, মেয়েকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে। আজ রাত্রেই তুমিও মুক্ত হইবে।"

মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করিলেন না।

ব্রহ্মচারী ইহা বুঝিয়া বলিলেন, "তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তি পাইবে।"

এই কথা বলিতে বলিতেই কারাগারের দরজা খুলিয়া গেল। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র সিংহের খালাসের হুকুম হইয়াছে। সে যাইতে পারে।"

মহেন্দ্র অবাক হইয়া পরীক্ষার জন্য রাজপথ পর্যন্ত গেলেন। কেহ বাধা দিল না। তিনি কারাগারে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।"

ব্রহ্মচারীর গান জীবানন্দ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাও দেখিয়াছিলেন। জীবানন্দ তাঁহার গান শুনিয়া বুঝিলেন, নদীর ধারে কোন স্ত্রীলোক নিশ্চয়ই পড়িয়া আছে। এস্থলে ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ জানিতেন, ব্রহ্মচারীর জীবন রক্ষা করার চেয়েও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়।

নদীর ধারে ধারে চলিয়া জীবানন্দ দেখিলেন, এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর একটি জীবিতা শিশুকন্যা। জীবানন্দ ভাবিলেন, আগে মেয়েটিকে রক্ষা করা দরকার,

নইলে বাঘ-ভালুকে খাইবে। এই ভাবিয়া জীবানন্দ মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

জীবানন্দ ঠাকুর জঙ্গল পার হইয়া একখানি ছোট গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। এক বৃহৎ আম বাগানের মধ্যে একটি ছোট বাড়ি। সেই বাড়িতে যাইতেই ঘরের ভিতর হইতে একটি সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। সে জীবানন্দের বোন শ্রীমতী নিমাইমণি। নিমাই অতি আগ্রহে দাদার নিকট হইতে মেয়েটিকে পালিবার জন্য চাহিয়া নিল।

নিমাই দাদাকে অনুরোধ করিয়া ভুরিভোজন করাইল। খাওয়া শেষ হইলে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "দাদা, বৌকে একবার ডাকবো ?"

ব্রত সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই। সুতরাং জীবানন্দ নিমির কথা শুনিয়াই "আমি চল্লাম" বলিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া চলিলেন। কিন্তু নিমি তাঁহাকে ছাড়িল না, সামনের কুড়েঘরে গিয়া এক স্ত্রীলোককে লইয়া আসিল। সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের চেয়ে বেশি বড় বলিয়া বোধ হয় না। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া

সে ঘরের মধ্যে আসিল, বোধ হইল যেন তাহার রূপে ঘর আলো হইল।

স্ত্রীকে দেখিয়া জীবানন্দের মন কেমন হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কেন দেখা করিলাম ?"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রতভঙ্গ করিলে ?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। চল ঘরে যাই—আমি আর ফিরিব না।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তারপর বলিল, "ছি !—তুমি বীর। পৃথিবীতে আমার বড় সুখ যে আমি বীরের স্ত্রী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে ?"—তারপর একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে ?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর খোঁজে যাইব। দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে জ্ঞানানন্দ নামে একজন সন্তান তাঁহাকে বলিলেন, "সত্যানন্দ প্রভু একা নগরের দিকে গিয়াছেন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "আমি একবার নগরে বেড়াইয়া আসি, তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

ভবানন্দ এক সুন্দর মোগল যুবক সাজিয়া সশস্ত্র মঠ হইতে বাহির হইলেন। সেখান হইতে কিছু দূরে মঠবাসীদিগের

ঘোড়াশালা হইতে একটি ঘোড়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি নগরের দিকে ছুটিলেন।

হঠাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল: পথের পাশে নদীর কিনারায় এক অতি সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন।

দেখিলেন, জীবনের লক্ষণ কিছুই নাই, পাশে একটা কৌটা পড়িয়া আছে, খালি। ভবানন্দ মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে দেখেন নাই, সুতরাং মৃতাকে চিনিলেন না; ভাবিলেন, কোন স্ত্রীলোক হয়ত বিষ খাইয়া মরিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বনের ভিতর হইতে একটা গাছের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। তাহা হাতে পিষিয়া রস করিয়া শবের মুখে দিলেন, নাকে দিলেন এবং শরীরে মাখিয়া দিলেন। বার বার এইরূপ করিতে করিতে দেখিলেন, যেন নিশ্বাস বহিতেছে, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে কল্যাণী চক্ষু মেলিলেন। তখন ভবানন্দ কল্যাণীর আধমরা দেহ ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দ্রুতবেগে নগরে গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানেরা জানিতে পারিল, সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুইজনে নগরের কারাগারে বন্দী হইয়াছেন। তখন শতে শতে সন্তান আসিয়া সেই দেবালয়ের চারিদিকের জঙ্গলে জমায়েত হইতে লাগিল। সেই বন হইতে অতি ভীষণশব্দে সহস্র কণ্ঠে একবারে ধ্বনিত হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

সরোষে সতেজে সেই সন্তান-বাহিনী নগরে আসিয়া

রক্ষীদিগকে মারিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে মুক্ত করিল।

সন্তানদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের খবর পাইয়া দেশের কর্তারা তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বন্দুক এবং একটা কামান দিয়া একদল সিপাহী পাঠাইলেন। সন্তানেরা আনন্দ-কানন হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কামানের কাছে লাঠি, সড়কি বা বিশ-পঁচিশটা বন্দুক কি করিবে ? সন্তানেরা পরাজিত হইয়া পলাইতে লাগিল।

অতি শৈশবে শান্তির মা মারা গিয়াছিলেন। তাহার বাবা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার টোলে কতকগুলি ছাত্র থাকিত। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া শান্তির স্বভাব ও হালচাল ছেলের মত হইয়াছিল। সে পিতার নিকট ছাত্রদের সঙ্গে বসিয়া লেখাপড়াও শিখিয়াছিল।

পিতা মারা গেলে জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তখনও তাহার ছেলের স্বভাব গেল না। শ্বশুর-শাশুড়ীর তাড়নায় শান্তি ঘর ছাড়িয়া বালক সন্ন্যাসীদের দলে মিশিল। সেখানে থাকিয়া শান্তি ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত এবং খুব পরিশ্রম করিত। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে অনেক দেশ-বিদেশ

ঘুরিল, অনেক লড়াই দেখিল এবং অস্ত্রবিদ্যা শিখিল; এক পণ্ডিত সন্ন্যাসীর কাছে কাব্যও পড়িল।

ইহার পর শান্তি শ্বশুরবাড়িতে আসিল। তখন তাহার আগের স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার শ্বশুর তখন মারা গিয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে ঘরে নিলেন না— জাতি যাইবে।

জীবানন্দ বাড়িতে ছিলেন। মাকে বুঝাইয়া তিনি শান্তিকে লইয়া নিমাইর বাড়িতে আসিলেন। ভগিনীপতি একটু জমি দিল। জীবানন্দ সেখানে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা শান্তির সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া গেলেন। তারপর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইর কৌশলে ঘটিল।

জীবানন্দ চলিয়া গেলে শান্তি একখানি ঢাকাই শাড়ীর পাড় ছিড়িয়া গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙাইল। মাথার চুল কিছু কাটিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিল। যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ার করিল। তারপর গৈরিক বসনে দেহ ঢাকিয়া, চুলগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া, হরিণচর্ম্মে কণ্ঠ হইতে জানু পর্যন্ত ঢাকিল এবং এইভাবে

সন্ন্যাসী সাজিয়া দুপুর রাত্রিতে অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পরদিন আনন্দমঠের ভিতর নির্জন ঘরে বসিয়া তিনজন সন্তান-নায়ক কথাবার্তা বলিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন?"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি, বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি-সোটা-বল্লমে কি হইবে! তাহা সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব। তাহারা পদচিহ্নে মহেন্দ্রের বাড়িতে বন্দুক-কামান প্রস্তুত করিবে। আজ রাত্রে মহেন্দ্র ও এক তরুণ যুবককে সন্তান-ধর্মে দীক্ষা দিব।"

সত্যানন্দের নিকটই তাঁহারা জানিলেন, যে মেয়েটিকে জীবানন্দ নিমাইর কাছে দিয়া আসিয়াছেন, সে মহেন্দ্রের কন্যা; আর ভবানন্দ যে স্ত্রীলোককে ঔষধ দিয়া বাঁচাইয়াছেন, সে মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু ভবানন্দ এ বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না।

সন্ধ্যার পরে সত্যানন্দ মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠের দেবালয়ে—যেখানে অপূর্ব শোভাময় চতুর্ভুজ মূর্তি রহিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আর একজন নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। ব্রহ্মচারী তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষা হইয়া গেলে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে পদচিহ্নে ফিরিয়া গিয়া সন্তানদের সাহায্যে এবং তাহাদের ভাণ্ডারের অর্থে তাঁহার গ্রামে একটি দুর্ভেদ্য গড় প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তিনি যে সকল শিল্পী পাঠাইবেন, তাহাদের দ্বারা সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইতে বলিলেন। মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।

মহেন্দ্র বিদায় হইলে নূতন দীক্ষিত শিষ্য আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিল। তিনি তাহার নাম দিলেন নবীনানন্দ। সত্যানন্দ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিলেন এবং জীবানন্দের ধর্মপত্নী বলিয়া জানিলেন। কিন্তু তিনি শান্তির বাহুবল দেখিয়া বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে ইস্পাতের ধনুকে লোহার গুণ পরাইতে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ এই চারিজন মাত্র সন্তান সমর্থ হইয়াছে, শান্তি অনায়াসে তাহাতে গুণ পরাইল।

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরের কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালায় ছয় আনা রকম মনুষ্যকে, কত কোটি তা কে জানে—যমপুরে পাঠাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে পৃথিবী শস্যশালিনী হইল; কিন্তু জনশূন্য দেশ জঙ্গলে ভরিয়া গেল।

এদিকে দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে হাজার হাজার সন্তান-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যেখানে সরকারের কর্মচারী পায় মারপিট করে, প্রাণবধ করে; যেখানে সরকারী টাকা পায় লুঠিয়া ঘরে আনে। সরকার দলে দলে সৈন্য পাঠায়, সন্তানেরা তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করে। সিপাহীরা হরিনাম শুনিলে ভয়ে পলায়। এমন কি, ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবও সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া একদল কোম্পানীর সৈন্য বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাষার কাস্তের নিকট শস্যের ন্যায় কাটা যাইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কান বধির হইয়া গেল।

সন্তানদিগের দেখাদেখি কতকগুলি চোয়াড়, হাড়ি, ডোম,

বাগদী, বুনো পরের জিনিস লুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। একদিন কাপ্তেন টমাসের সৈন্যের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া ভাল ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম-বাগদীর দল লোভ সামলাইতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদিগের বন্দুকের দুই-চারিটা গুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল।

কাপ্তেন টমাস তখনই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭৩০ জন বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীর মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে, ১২২৩ জন আহত হইয়াছে, ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটি সত্য।

সত্যানন্দ আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিলেন। সন্তানদের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, তিনি সন্তানদিগকে কি বলিবেন, এজন্য সকলকে ডাকিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান আসিয়া একত্র হইতে লাগিল।

সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত দশ হাজার সন্তানের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী বৈকুণ্ঠনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন, বাহুতে বল দিন্, মনে

ভক্তি দিন্, ধর্মে মতি দিন্। হে সন্তানগণ! টমাস্ নামে একজন বিধর্মী দুরাত্মা বহু সন্তান মারিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। শত্রুদের কামান আছে—কামান ছাড়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভব নয়। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধ যাত্রা করিব। ঐ দেখ প্রভাত হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কি ও—"

"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!" অকস্মাৎ বিশাল বনের চারিদিকে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। কাপ্তেন টমাস্ সন্তান-সম্প্রদায়কে এই আম্র-কাননে ঘিরিয়া মারিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

সত্যানন্দের আদেশে কয়েকজন সন্তান অশ্বারোহণে কাহার তোপ দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গেলেই অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া বনের মধ্যে সন্তানদের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা দশ হাজার সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।"

জীবানন্দ দশ হাজার সন্তান লইয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় ভবানন্দ আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইলেন। তখন কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলি সারি সারি সন্তানকে মাটিতে ফেলিয়াছে। ভবানন্দ বলিলেন, "এই নিশ্চিত মরণের মধ্যে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে —কে পার ভাই ? এমন সময় গাও 'বন্দে মাতরম্'।" সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে সন্তান-সেনা তোপের তালে গর্জ্জিয়া উঠিল "বন্দে মাতরম্।"

সেই দশ হাজার সন্তান "বন্দে মাতরম্" গাহিতে গাহিতে বল্লম উঠাইয়া অতি দ্রুতবেগে তোপগুলির উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড-বিখণ্ড, বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তবুও সন্তান-সৈন্য ফিরিল না।

বাঁ-দিকে নদী, নূতন বর্ষায় অতি প্রবল। নদীর উপরে একটি পুল। টমাস্ কাপ্তেন হে নামক একজন সহযোগীকে পুলের মুখ বন্ধ করিয়া বাঁ-দিক হইতে সন্তানদিগকে আক্রমণ করিতে হুকুম দিল। টমাস্ নিজে দুই শত মাত্র পদাতিক লইয়া ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কাপ্তেন ওয়াট্সন দক্ষিণ দিক হইতে সন্তানদিগকে আক্রমণ করিল।

এইরূপে তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তান-সৈন্য

বিপদে পড়িল। চতুর ভবানন্দ অতি সহজেই টমাসের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া টমাস্‌কে বন্দী করিল।

এদিকে জীবানন্দ ও ধীরানন্দ সন্তান-সেনাদের লইয়া পুলের দিকে আসিতেই কাপ্তেন হে ও ওয়াট্‌সন তাহাদিগকে
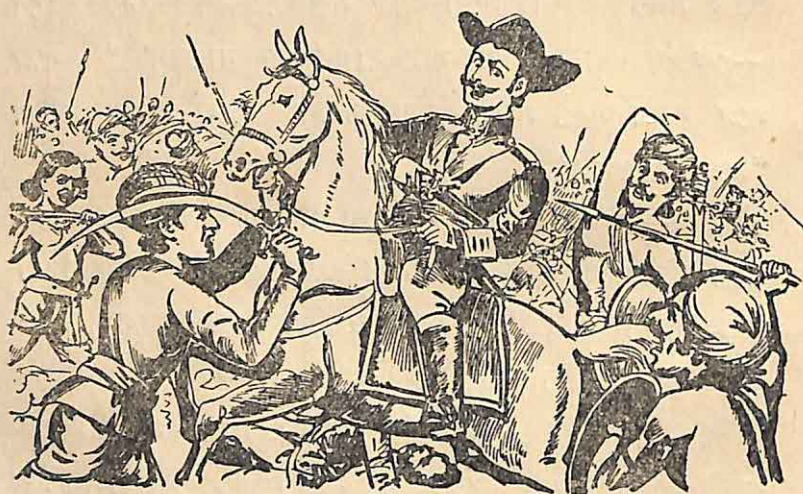
দুই দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। সন্তান-সৈন্যের আর পলাইবার পথও রহিল না।

এমন সময় বনের মধ্য হইতে মহেন্দ্রের আনীত সতরটি নূতন তোপ ডাকিল—গুড়ুম্ গুম্—বুম্ বুম্! এই হঠাৎ আক্রমণে হে ও ওয়াট্‌সনের সৈন্যদল একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন

হইয়া গেল। কাপ্তেন টমাসের সমস্ত সৈন্য মরিল। রণক্ষেত্রে আর শব্দও রহিল না।

কিন্তু সেই যুদ্ধে ভবানন্দ স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে সন্তান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

যুদ্ধশেষে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "এখন কার্যোদ্ধার হইয়াছে, তুমি আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্র চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন, মেয়ে বাঁচিয়া আছে শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় জানি না।"

সত্যানন্দ শান্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ, ইনি তোমার মেয়ের সন্ধান বলিয়া দিবেন।"

তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। শান্তি মহেন্দ্রকে লইয়া নিজের আশ্রমে আসিল এবং একটু পরেই নগরের দিকে যাত্রা করিল।

সেই রাত্রিতে হরিধ্বনিতে সেই প্রদেশ পরিপূর্ণ হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে-সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরম্", কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

কল্যাণী ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া গভীর রাত্রে নগরের এক দোতলা বাড়ী হইতে রাজপথে বাহির হইলেন, মনে মনে বলিলেন, "হে মধুসূদন, আজ আমার সহায় হও। আজ যেন পদচিহ্নে তাঁহার দেখা পাই।"

পথে আসিয়া কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও একদল বিদ্রোহীর হাতে পড়িয়া গেলেন। তাহারা বিষম চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও একজন দস্যু পিছনে আসিল। সেই সময় কোথা হইতে আর একজন আসিয়া লোকটাকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পিছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু সে শান্তি। শান্তি কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে ?

কল্যাণী বলিলেন, "পদচিহ্নে।"

শান্তি অবাক হইল, বলিল, "সে কি ?—পদচিহ্নে ? মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ ?"

কল্যাণী বলিলেন, "তুমি কে ? তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী, সন্তান-সেনার একজন নায়ক—ঘোরতর বীরপুরুষ। আমি সব জানি।"

কথাবার্তায় কল্যাণী বুঝিলেন, আগন্তুক পুরুষ নহে, রমণী। শান্তি কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া বনের পথে লইয়া চলিল।

গভীর রাত্রে শান্তি যখন আশ্রম ছাড়িয়া নগরে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দকে বলিয়া আসিয়াছিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে, উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ সকলই জানিতেন। মহেন্দ্রকে সমস্ত কথা বলিলেন। মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

পরদিন সকালবেলা শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর দেখা হইল।

কল্যাণী শান্তিকে বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত। আমাদের মেয়েটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

জীবানন্দ বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে যান—সেইখানে আপনাদের মেয়েকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ হইল না।

শেষে একদিন পদচিহ্নে নূতন দুর্গের মধ্যে মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী—সকলে মিলিলেন। সেখানে মহেন্দ্র শান্তির প্রকৃত পরিচয় পাইলেন।

এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। তিনি সন্তানদের দমন করিবার জন্য মেজর এডওয়ার্ডস্ নামক সেনাপতিকে নূতন সেনা দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

এডওয়ার্ডস্ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, সন্তানেরা পদচিহ্নে দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেইখানে তাহাদের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ দখল করা উচিত বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু চরেরা পদচিহ্নের যে সংবাদ আনিল, তাহাতে তিনি হঠাৎ দুর্গ আক্রমণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। মনে মনে এক ফন্দী আঁটিলেন।

মাঘী পূর্ণিমায় তাঁহার শিবিরের কাছে নদীর পারে এক মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সকল সন্তান মেলায় একত্র হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর এডওয়ার্ডস্

ভাবিলেন যে, পদচিহ্নের রক্ষকেরাও নিশ্চয়ই মেলায় আসিবে ; সেই সময়ে পদচিহ্ন আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি রটনা করিয়া দিলেন যে, তিনি মেলা আক্রমণ করিবেন।

এই সংবাদ পাইয়া সমস্ত সন্তান অস্ত্র লইয়া মেলা-রক্ষার জন্য ধাবিত হইল। মহেন্দ্রও সাহেবের ফাঁদে পা দিলেন। পদচিহ্নের দুর্গে অল্প সৈন্য রাখিয়া তিনি অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

জীবানন্দ ও শান্তি এই সকল সংবাদ জানিবার আগেই পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ; কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে, মেলায় সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজ-সৈন্যের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া বীর-দম্পতি দেখিতে পাইলেন, নিচে কিছু দূরে ইংরেজের শিবির। তখন দুইজনে কানে কানে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে

লুকাইলেন, আর শান্তি নবীনানন্দের বেশ ছাড়িয়া দিব্যি এক বৈষ্ণবী সাজিল।

শান্তি একটি সারঙ্গ হাতে লইয়া বৈষ্ণবীর সাজে ইংরেজ-শিবিরে দেখা দিল। সিপাহীরা তাহার গান শুনিয়া বড় মাতিয়া গেল। বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন, একজন সিপাহী তাহা জানিত। সে বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া সাহেবের কাছে লইয়া গেল।

শান্তি সাহেবকে পদচিহ্নের দুর্গের বিষয় যাহা মুখে আসিল বলিল। শেষে স্থির হইল, শান্তিকে লইয়া লিণ্ডলে নামক এক সৈনিক ঘোড়ায় পদচিহ্নে যাইবে এবং সেই রাত্রিতেই পদচিহ্ন দুর্গের সমস্ত সংবাদ আনিয়া দিবে। এজন্য শান্তি পাঁচশত টাকা বকশিশ পাইবে।

একটা আরবী ঘোড়া আসিল; লিণ্ডলে শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "আগে চল, ছাউনি ছাড়াই।"

লিণ্ডলে ঘোড়ায় চড়িল; ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া চলিল। শান্তি পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে শান্তি লিণ্ডলের পায়ের উপর

পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ডলে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়সোয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়সোয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছিঃ! রেকাব পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া!"

বাহাদুরি দেখাইবার জন্য লিণ্ডলে রেকাব হইতে পা তুলিয়া
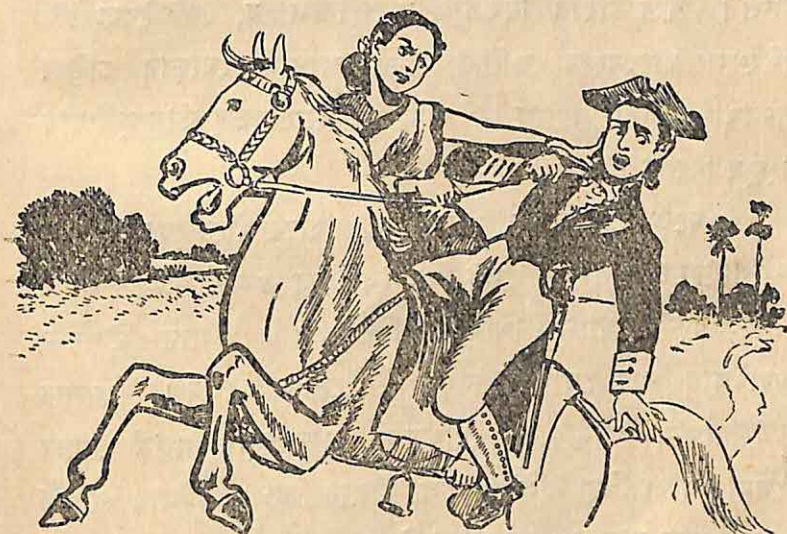
লইল। শান্তি অমনি নির্বোধ ইংরেজের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। লিণ্ডলে পা ভাঙ্গিয়া

পড়িয়া রহিল। শান্তি বায়ুবেগে ঘোড়া চালাইয়া জীবানন্দের কাছে গিয়া সকল কথা বলিল। জীবানন্দ বলিলেন, "আমি এখনই গিয়া মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি ঘোড়ায় যাও— মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দেও।" তখন দুইজনে দুইদিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

এডওয়ার্ডস্ পাকা ইংরেজ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ডলে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই এডওয়ার্ডস্ তাঁবু তুলিবার হুকুম দিলেন।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তান-সেনা লইয়া ধীরে ধীরে মেলার পথে আগাইয়া চলিলেন। সেই দিন বৈকালে একটা টিলার ধারে এক বড় বাগানে শিবির করিয়া তিনি টিলার উপরটা দেখিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। কিছুদূর উঠিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, এক যুবা সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সেনার মধ্যে গিয়া বলিল, "চল, টিলায় চড়। টিলার ওপিঠে এডওয়ার্ডস্ সাহেব। যে আগে উপরে উঠিবে, তাহারই জিত।"

সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ। তখন "হরে মুরারে" ধ্বনি করিতে করিতে যাবতীয় সন্তান-সেনা

জীবানন্দের সঙ্গে বেগে টিলার উপরে উঠিতে লাগিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া অবাক হইলেন। ভাবিলেন, এ কি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পর্বত হইতে নামিতে লাগিলেন। পথে জীবানন্দের দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ বলিলেন, "টিলার ওপিঠে শত্রু। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, বন্দে মাতরম্।"

কিন্তু ইংরেজের কামানের "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্" শব্দে সে গীতি ভাসিয়া গেল। কামান লইয়া ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা আগেই শিখরদেশ অধিকার করিয়া সন্তান-সেনাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে লাগিল। সন্তান-সেনা কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলকে বিনাশ করিবার জন্য "হুর্‌রে! হুর্‌রে!" শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিয়া সন্তান-সেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

জীবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস। হরির নাম করিয়া শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।" কিন্তু কেহই আসিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিলে না, তবে আমি একাই চলিলাম।" তারপর ঘোড়ার পিঠে উঁচু হইয়া পিছনে বহুদূরে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, নবীনানন্দকে বলিও, আমি চলিলাম, পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ গোলাবৃষ্টির মধ্যে বেগে অশ্বচালন করিলেন,—বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে 'হরে মুরারে'!

জীবানন্দের অমানুষিক কীর্তি দেখিয়া সমস্ত সন্তান-সৈন্য 'মার মার' শব্দে ফিরিয়া ইংরেজ-সৈন্যের দিকে ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজ-সেনার মধ্যে একটা ভারী হুলস্থূল পড়িয়া গেল। টিলার শিখর হইতে অসংখ্য সন্তান-সেনা বীরদর্পে ইংরেজ-সেনা আক্রমণ করিল। মহেন্দ্রও তাঁহার বাহিনী লইয়া বিপুল বিক্রমে পশ্চাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তারপর যেমন দুইখণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের ঘষায় ক্ষুদ্র মাছি পিষিয়া যায়, তেমনি দুই সন্তান-সেনার সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য পিষিয়া মরিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোকও রহিল না।

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র এখন স্থির।

গভীর রাত্রিতে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে একটি মশাল জ্বালিয়া শবরাশির মধ্যে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেকটি শব অনুসন্ধান করিয়া রমণী সকল মাঠ ফিরিল—যাহা খোঁজে, তাহা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া সেই শবরাশিপূর্ণ রক্তে রাঙ্গা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় কে যেন অতি মধুর স্বরে বলিল, "উঠ মা! কাঁদিও না।"

শান্তি চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ। তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শব উপরি উপরি পড়িয়া আছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, জীবানন্দের দেহ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে মাখা। শান্তি সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

মহাপুরুষ বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "কাঁদিও না মা! শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। তুমি ইহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, ইহার চিকিৎসা করিব।"
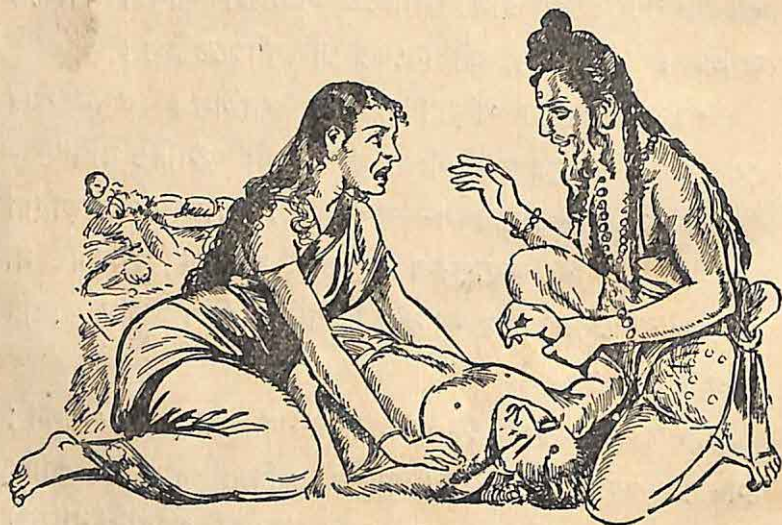
শান্তি চক্ষু মুছিয়া অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্ত ধুইয়া দেও, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীর পারে লইয়া গিয়া রক্ত ধুইল। চিকিৎসক জীবানন্দের ক্ষতগুলিতে বন্য লতাপাতার প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন, তারপর বারবার জীবানন্দের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন; শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল ?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। কাহাকে প্রণাম করিবে ?

জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল।"

শান্তি বলিল, "মা'র কার্যোদ্ধার হইয়াছে। এদেশ সন্তানের হইয়াছে। তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। এ ফিরিয়া পাওয়া দেহে সন্তানের আর অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি।"

জীবানন্দ বলিলেন, "আমার কাজ মাতৃসেবা। মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।"

শান্তি। তা কি আমি বলিতেছি? আমরা আর গৃহী নহি; দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াই। তারপর হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মা'র মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কোথায় চলিয়া গেলেন!

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?

—শেষ—